কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২২

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৩৪

সূরা বাকারাহ ১৫৪-১৫৭

আয়াতুল কুরসীর ফযিলত

(১) সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত :

আয়াতুল কুরসী কুরআন মাজীদের সমস্ত আয়াতের চেয়ে বেশী ফযীলতপূর্ণ। হাদীছে এসেছে-

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছঅঃ) বলেছেন, 'হে আবুল মুনযের! তুমি কি জানো আল্লাহর কিতাব কুরআনের মধ্যে থেকে তোমার নিকট কোন আয়াতটি অধিক ফযীলতপূর্ণ? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি আবার বললেন, 'হে আবুল মুনযের! তুমি জানো আল্লাহর কিতাব কুরআনের মধ্যে থেকে তোমার নিকট কোন আয়াতটি অধিক ফযীলতপূর্ণ? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আয়াতুল কুরসী, তিনি আমাকে শাবাশ জানিয়ে আমার বুকে হাত রাখলেন এবং বললেন, 'হে আবুল মুনযের! তোমার জ্ঞানে বরকত হোক'।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহিঃ) আয়াতটি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে বলেন, এ আয়াতে যে বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে, কুরআনের অন্য কোন আয়াতে তা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে এ আয়াতের সম্মিলিত বিষয়বস্তুর কিছু আল্লাহ তা'আলা সূরা হাদীদের প্রথম দিকে ও সূরা হাশরের শেষের কয়েক আয়াতে উল্লেখ করেছেন, শুধুমাত্র এক আয়াতে নয়

ইবনে আসক্বা' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, 'তিনি মুহাজিরগণের মধ্যে ছুফফাবাসীদের অবস্থান স্থলে আসলে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! কুরআন মাজীদের মধ্যে সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ আয়াত কোনটি? তিনি বললেন, 'আয়াতুল কুরসী'।

(২) আয়াতুল কুরসী পাঠকারী হতে শয়তান দূরে থাকে :

আয়াতুল কুরসী পাঠকারী হতে শয়তান দূরে থাকে; এমনকি রাতে শোয়ার জন্য বিছানায় যাওয়ার পর কেউ যদি আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, তাহলে তখন একজন ফেরেশতা রাতব্যাপী ঐ ব্যক্তিকে সংরক্ষণ করে, সকাল পর্যন্ত শয়তান তার নিকট আসে না। হাদীছে এসেছে-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে রামাযানের ফিতরা সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। একদা এক ব্যক্তি এসে মুষ্টি ভরে ভরে ফিতরার মাল নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি তাকে আটকিয়ে বললাম, আমি যে কোনভাবে তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, আমি গরীব মানুষ, স্ত্রী-সন্তান আছে আর আমি অভাবের মধ্যে আছি; তাই আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম, সকালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আবু হুরায়রা! গত রাতে তোমার বন্দীর কী হল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! সে তার অভাবের কথা এবং স্ত্রী-সন্তানের কথা বলেছিল তাই আমি তাকে

দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'সতর্ক থাকো, সে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে'। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলাতে আমি নিশ্চিত হলাম যে, সে আবার আসবে। তাই আমি তার অপেক্ষায় বসে থাকলাম, সে আসল এবং ফিতরার মাল থেকে মুষ্টি ভরে ভরে নিতে লাগল। আমি আবার তাকে আটক করলাম এবং বললাম, এখন আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি অভাবী, আমার পরিবার-পরিজন আছে, ভবিষ্যতে আর আসব না। আমি দয়া করে তাকে আবার ছেড়ে দিলাম। সকালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞস করলেন, 'হে আবু হুরায়রা! তোমার বন্দীর কী হল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! সে তার মারাত্মক অভাবের কথা বলল, তার পরিবার-পরিজনের চাহিদার কথা বলল, আমি দয়ার বশবর্তী হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'সতর্ক থাকো, সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে'। তাই আমি তৃতীয়বার তার আগমনের অপেক্ষায় থাকলাম, সে আসল এবং আবার ফিতরার মাল মুষ্টি ভরে নিতে লাগল, আমি তাকে আটক করলাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাব, এটা তিনবারের শেষবার। প্রত্যেকবার তুমি ওয়াদা কর যে, আসবে না। কিন্তু তুমি আবার চলে আস। সে বলল, আমি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখাব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন, কিন্তু এর বিনিময়ে তুমি আমাকে ছেড়ে দিবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ কথাগুলো কী? সে বলল, যখন তুমি রাতে শোয়ার জন্য বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে; তাহলে একজন ফেরেশতা রাতব্যাপী তোমাকে সংরক্ষণ করবেন, সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকট আসবে না। একথা শুনে আমি তাকে আবার ছেড়ে দিলাম, সকালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গতরাতে তোমার বন্দীকে কী করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! সে বলল যে, আমি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখাব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'ঐ কথাগুলো কী? আমি বললাম, সে বলেছে যে, যখন তুমি রাতে বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা রাতব্যাপী তোমাকে সংরক্ষণ করবে, আর শয়তান তোমার নিকট আসবে না। ছাহাবীগণ যেহেতু ভালো এবং কল্যাণের কাজে উৎসাহী ছিলেন, তাই তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে কিছু বললেন না, বরং বললেন, 'সে তোমাকে সত্য কথা শিখিয়েছে, কিন্তু সে নিজে মিথ্যুক। তুমি কি জানো গত তিন রাত ধরে তোমার নিকট কে আসত? আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, না। রাসূল (সাঃ) বললেন, 'সে হল শয়তান'।

একই মর্মে ছাহাবী উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তার একটি খেজুরের গুদাম ছিল। একদা তিনি খেজুরের মধ্যে কিছুটা কমতি অনুভব করলেন, তাই রাতে তিনি তা পাহারা দিতে বসে গেলেন, হঠাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের ন্যায় একটি ছেলে আসল এবং সালাম দিল, উবাই (রাঃ) সালামের উত্তর দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জিন না মানুষ? সে উত্তরে বলল, আমি জিন। উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বললেন, তোমার হাত দেখাও! তিনি হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তার হাত কুকুরের হাতের ন্যায়, কুকুরের ন্যায় শরীরের পশমও ছিল। উবাই ইবনে কা'ব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, জিনেরা কি এই আকৃতিরই? সে উত্তরে বলল, হ্যাঁ। আর জিনেরা জানে যে, তাদের মধ্যে আমার মতো শক্তিধর আর কেউ নেই। উবাই (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কি জন্য এসেছ? জিন উত্তরে বলল, আমরা জেনেছি যে, তুমি দান করা পসন্দ কর; তাই তোমার খাদ্য থেকে আমাদের অংশ নিতে এসেছি। উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমাদেরকে অর্থাৎ মানুষকে কোন জিনিস তোমাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করবে? সে বলল, সূরা বাক্বারার আয়াতুল কুরসী তেলাওয়াত করতে পার? উবাই (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ পড়তে পারি। জিন বলল, যখন তুমি

সকালে তা পাঠ করবে, তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবে এবং সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত আমাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবে। উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, সকাল হলে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আসলাম এবং ঘটনাটি খুলে বললাম। তিনি তা শুনে বললেন, খবীছ (শয়তান) সত্য বলেছে'।

(৩) প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করা জান্নাত লাভের কারণ :

হাদীছে এসেছে,

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে দূরত্ব থাকে শুধু মৃত্যু'।

রাসূল (সাঃ)-এর বাণী, 'তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে দূরত্ব থাকে শুধু মৃত্যু' এর ব্যাখ্যায় ত্বীবী (রহিঃ) বলেন, মৃত্যু হল তার ও জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক। অতএব, যখন তা বাস্তবে রূপ নিবে, তখনই তার জান্নাতে প্রবেশ বাস্তবায়িত হবে।

(৪) আয়াতুল কুরসীতে রয়েছে ইসমে আ'যম :

আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, আর আমাদেরকে সে নামগুলোর মাধ্যমে তাঁকে ডাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই বরকতময় নামগুলোর মাঝে রয়েছে ইসমে আ'যম, যে নামের মাধ্যমে (অসীলায়) চাইলে দেয়া হয় এবং তার মাধ্যমে প্রার্থনা করলে গ্রহণ করা হয়। এ সম্পর্কে বিশ্বনবী (সাঃ) সংবাদ দিয়েছেন, 'নিশ্চয়ই ইসমে আ'যম কুরআনের কতিপয় আয়াতে রয়েছে। আয়াতুল কুরসী সেই আয়াতগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ, আসমা বিনতে ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ 'আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরপরিচালক' (বাক্বারাহ, ২৫৫)। অন্যত্র আছে, الم – اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

'আলিফ, লাম, মীম। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরপরিচালক' (আলে ইমরান, ১-২)। এ আয়াত দু'টিতে ইসমে আ'যম রয়েছে'।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহিঃ)-এর মতে, ইসমে আ'যম হল (اَلْحَيُّ) আল-হাইয়্যু। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, আল-হাইয়্যুতে সকল গুণগুলো বিরাজমান এবং এটাই হল তার মূল। এ কারণেই কুরআনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত আয়াত হল, اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ 'আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরপরিচালক'। এটাই হল ইসমে আ'যম। কেননা প্রত্যেক সৃষ্টিজীবই হায়াত কামনা করে। এজন্যই তা সকল গুণ সম্বলিত। যদি সকল গুণ একটি গুণ দ্বারা প্রকাশ করা হত, তবে আল-হাইয়্যু দ্বারা প্রকাশ করাই যথেষ্ট হত'।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিঃ)-এর মতে, ইসমে আ'যম হল, আল-হাইয়্যুল কাইয়্যুম। তিনি বলেন, ইসমে আ'যম আল্লাহ তা'আলার এমন নাম, যার অসীলায় প্রার্থনা করা হলে কবুল করেন এবং সে নামের অসীলায় চাওয়া হলে দেয়া হয়। আর তা হল, আল-হাইয়্যুল কাইয়্যুম।

আয়াতুল কুরসীর এমন ফযীলতের কথা ভেবে অনেকেই ঘরে আয়াতুল কুরসীর লিখিত কাগজ বাঁধাই করে তা'বীয আকারে ঝুলিয়ে রাখেন। কিন্তু এভাবে ঘরে আয়াতুল কুরসী লিখিত কাগজ বাঁধাই করে রাখার আলাদা কোন উপকারিতা, সুফল কিংবা ফযীলত নেই। বরং তা ইসলামী নির্দেশনার পরিপন্থী। আয়াতুল কুরসী কুরআনের একটি আয়াত বৈ অন্য কিছু নয়। কুরআনে কারীমে এ ছাড়া আরও আয়াত রয়েছে। মুসলিমদের ঘরে ঘরে রয়েছে কুরআন। মনে রাখতে হবে, কুরআন ঘরে রাখার মাঝে আলাদা কোন ফযীলত নেই। ঘরে রাখা কুরআন তেলাওয়াত করলেই কেবল ঘরে কুরআন রাখা স্বার্থক হবে।

তাফসীর

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ ؕ وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾

২৫৪. হে মুমিনগণ! আমরা যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না, আর কাফেররাই যালিম।

ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান এবং কাফের ও মুশরিকরা নিজেদের ইমাম অর্থাৎ, নবী, ওলী, বুযুর্গ এবং পীর-মুরশিদ ইত্যাদিদের ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখত যে, আল্লাহর উপর তাঁদের এত প্রভাব যে, তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্বের প্রতাপে তাঁদের অনুসারীদের ব্যাপারে যা চাইবেন আল্লাহর কাছ থেকে তা মানিয়ে নিতে পারবেন এবং মানিয়ে নিবেন। আর এটাকেই তারা শাফাআত বা সুপারিশ বলে। অর্থাৎ, প্রায় বর্তমানের অজ্ঞ মুসলিমদের মতই ছিল তাদের আকীদা ও বিশ্বাস। এদের (বর্তমানের অজ্ঞদের) কথা হল, আমাদের বুযুর্গরা আল্লাহর কাছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে যাবেন এবং ক্ষমা করিয়েই উঠবেন। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট এ রকম কোন সুপারিশের অস্তিত্বই নেই। এ ছাড়া 'আয়াতুল কুরসী' এবং আরো অনেক আয়াতে ও হাদীসসমূহে বলা হয়েছে যে, সেখানে (কিয়ামতে) এক দ্বিতীয় প্রকারের শাফাআত অবশ্যই হবে, কিন্তু এই শাফাআত কেবল তাঁরাই করতে পারবেন, যাঁদেরকে আল্লাহ অনুমতি দান করবেন। আর এই সুপারিশ কেবল সেই বান্দার জন্যই করতে পারবেন, যার জন্য মহান আল্লাহ অনুমতি দেবেন। তিনি এই অনুমতি কেবল তাওহীদবাদীর জন্যই দেবেন। আর এই সুপারিশ ফিরিশতারাও করবেন, নবী-রসূল এবং শহীদ ও সালেহীনরাও করবেন। তবে তাঁদের মধ্যেকার কোন ব্যক্তিত্বের কোন দাপ ও চাপ আল্লাহর উপর থাকবে না। বরং তাঁরাই আল্লাহর ভয়ে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত হবেন যে, তাঁদের মুখমন্ডল বিবর্ণ হতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, তারা সুপারিশ করে কেবল তাদের জন্য, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। (সূরা আম্বিয়া ২৮ আয়াত)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۵﴾

২৫৫। আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং যমীনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু’টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান।

এই আয়াতটি আয়াতুল কুরসী নামে খ্যাত। এখানে মহান আল্লাহর এমন পূর্ণাংগ পরিচিতি পেশ করার হয়েছে, যার নজীর আর কোথাও নেই। তার হাদীসে একে কুরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে লোক প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল-কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না। [নাসায়ী, দিন-রাতের আমলঃ ১০০] অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জান্নাতের ফলাফল এবং আরাম আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে। অনেকেই এ সূরার আয়াতুল কুরসীতে “ইসমে আযম” আছে বলে মত দিয়েছেন।

আয়াতুল কুরসীর বিশেষ তাৎপর্যঃ এ আয়াতে মহান রব আল্লাহ জাল্লা-শানুহুর একক অস্তিত্ব, তাওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহর অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া, তার সত্তার অপরিহার্যতা, তার অসীম-অনন্ত কাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী হওয়া যাতে তার অনুমতি ছাড়া তার সামনে কেউ কোন কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুনিচয়কে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃংখলা বজায় রাখতে গিয়ে তাকে কোন ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যাতে কোন প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোন অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে না পারে। এই হচ্ছে আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। আল্লামা ইবনে কাসীর বলেনঃ এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে। প্রতিটি বাক্যের সাথেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা রয়েছে।

১ম বাক্যঃ اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

অনুবাদঃ আল্লাহ – তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

“আল্লাহ” নাম সম্পর্কিত ব্যাখ্যাঃ

"আল্লাহ" শব্দটি সৃষ্টিকর্তার নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মহত্তর ও তার যাবতীয় গুণের সম্মিলিত রূপ। কোন কোন আলিম একে ইসমে আযম বলেও অভিহিত করেছেন। এ নামটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়, এজন্যই এ শব্দটির দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। কেননা, আল্লাহ এক, তার কোন শরীক নেই।
মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী লিখেছেনঃ "আল্লাহ" সবচেয়ে মহান পবিত্র সত্তার নাম। এ নামটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তার নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মহান ও অদ্বিতীয় নাম। সত্যের অস্তিত্বের এক সত্তার নাম, প্রভুত্বের যাবতীয় গুণাবলীর সম্মিলিত রূপ। প্রতিপালনের যাবতীয় গুণাবলীতে গুণান্বিত, বাস্তব অস্তিত্বের একমাত্র সত্তা, তিনিই সেই পবিত্র সত্তা যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। (সাফওয়াতুত তাফাসীর, ১ম খণ্ড)

ইবনে কাসির লিখেছেনঃ "আল্লাহ" শব্দটি মহাবিশ্বের একমাত্র মহান প্রতিপালক মহাপ্রভুর নাম। কেউ কেউ বলেন, সেটিই ইসমে আজম। কারণ, "আল্লাহ" শব্দের মধ্যে সকল গুণের সমাবেশ ঘটেছে। যেমন আল্লাহ বলেনঃ *"তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা-বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ – সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রুপদাতা, সকল উত্তম নাম তারই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরাহ আল-হাশর, ৫৯ : ২২-২৪)*

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত অন্যান্য সকল গুণকে "আল্লাহ" এর সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেখিয়েছেন। অনুরূপভাবে অন্যত্র বলেছেনঃ
"আর আল্লাহ'র সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, তোমরা সেসব নামে তাকে ডাকো ...." (সূরাহ আল-আরাফ, ৭ : ১৮০)
"বলোঃ আল্লাহ বলে আহবান করো কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহবান করো না কেন, সব সুন্দর নাম তো তারই ....." (সূরাহ বানি ঈসরাঈল, ১৭ : ১১০)

.... "আল্লাহ" একটি অনন্য নাম। মহাবিশ্বে একক মহান প্রতিপালক প্রভু ভিন্ন অন্য কেউ উক্ত নামে অভিহিত নয়। এ কারণেই আরবী ভাষায় সেটির সম-ধাতুজ কোন সমাপিকা ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয় না। ....."

"আল্লাহ" শব্দটি মূলতঃ "ইলাহ" শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। এটির প্রথমের "আলিফ" (হামজা) উহ্য করে দিয়ে সেখানে "আলিফ" ও "লাম" বসানো হয়েছে এবং একই স্থানের দুই "লাম" পরস্পর মিলিত হয়েছে। এভাবে "আল্লাহ" শব্দটি গঠিত হয়েছে।

আভিধানিক অর্থে "ইলাহ" বলা হয় এমন প্রত্যেক মাবুদকে, যার কোন না কোন প্রকারের ইবাদাত-বন্দেগী ও আনুগত্য আরাধনা করা হয়। কিন্তু এর উপর "আলিফ" ও "লাম" অক্ষর দুটো বসার ফলে "আল্লাহ" শব্দটি গঠিত হয়েছে বিধায় এর অর্থ সম্পূর্ণ নতুনভাবে গ্রহণ করেছে।

আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র সেই মহান সত্তা, যিনি নিজ ক্ষমতা ও প্রতিভার দ্বারা বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, এটির যাবতীয় প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ করে সেটিকে ক্রমশঃ বিকাশ দান করছেন, সামনের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং এই সব কারণে নির্দিষ্টভাবে একমাত্র তিনিই সকল প্রকার পূজা-উপাসনা ও আনুগত্য-ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত ও নিরঙ্কুশভাবে এই সব কিছুরই অধিকারী।

"আল্লাহ" খোদা তাআলার নিজ মূল সত্তার নাম। এ নাম তিনি ছাড়া আর কারো জন্য ব্যবহৃত হতে পারে না। কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে – "যিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কেউই ইলাহ নয়, আর কোন ইলাহ নেই।" বস্তুতঃ ইলাহ হওয়ার যে সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ভাবধারা, তা-ই এই শব্দটির মৌলিক অর্থ। এটি ছাড়া আল্লাহ'র আরো যতো নাম আছে, তা সবই এর অধীন, এবং তা সবই আল্লাহ'র গুণবাচক নাম।

"ইলাহ" শব্দের ব্যাখ্যাঃ

"আল্লাহ" নাম সম্পর্কিত আলোচনায় "ইলাহ" সম্পর্কিত কিছু আলোচনা চলে এসেছে, এতে "ইলাহ" এর সহজ ব্যাখ্যাও সাথে সাথে চলে এসেছে। একটু পর পূর্ণ প্রথম অংশের ব্যাখ্যায় আরো পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। আর পূর্বে "ইলাহ" সম্পর্কিত ছোট্ট একটি আলোচনা –

আরবদের কাছে "ইলাহ" কোন একক সত্তার নাম ছিলো না, বরং তারা যে সমস্ত দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করতো, এদের প্রত্যেকের জন্য এই শব্দ প্রয়োগ করতো। আল-কুরআনের কোথাও "আল-ইলাহ" শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। শুধু "ইলাহ" আর "আল্লাহ" শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বিভিন্ন আয়াতে "ইলাহ" শব্দ দিয়ে ঐ সমস্ত উপাস্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, মানুষ যাদের পূজা-অর্চনা, উপাসনা ও আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। বহু আয়াতে আল-কুরআন দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, "ইলাহ" আখ্যায়িত হওয়ার একমাত্র অধিকার আল্লাহ'র-ই জন্য সংরক্ষিত। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও সমস্ত ইবাদাতের হকদার, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আল-কুরআনের এই ঘোষণাটি শুধু আরব অঞ্চলের অবিশ্বাসীদের জন্য সীমিত নয়, এটি সমগ্র দুনিয়াবাসীর প্রতি, যেখানে প্রতিমা পূজার বিশ্বাস ব্যাপকতা লাভ করেছিলো আর যেখানে আল্লাহ'র প্রকৃত সত্তা, তার গুণাবলী ও অবস্থান সম্পর্কে মানব অন্তর বহুবিধ পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলো।

"আল্লাহ – তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই" – এর ব্যাখ্যাঃ

"তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই" – এর ব্যাখ্যায় ইবনে জারীর আত-তাবারী লিখেছেনঃ এ কালেমায় আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তো চিরঞ্জীবী, চিরস্থায়ী। তাছাড়া, তিনি অন্যান্য গুণেরও অধিকারী, যা এ আয়াতে তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ এমন এক সত্তা, শুধু যার জন্যই সৃষ্টির ইবাদাত নির্ধারিত। তিনি চিরঞ্জীবী ও চিরস্থায়ী। আল্লাহ ছাড়া তোমরা কারো ইবাদাত করো না। কেননা, তিনি এমন চিরঞ্জীবী চিরস্থায়ী, যাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। এ আয়াতে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেওয়া আহকাম ও নিদর্শনাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর তারা রাসুলগণের আবির্ভাবের পর আল্লাহ'র নিদর্শনাদির মধ্যে মতভেদ করেছে। তাদেরকে আল্লাহ অবহিত করেছেন যে, তিনি রাসুলগণের মধ্যে কাউকে আবার কারো থেকে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। বান্দাগণ মতভেদ করার পর একে অন্যের সাথে বিবাদ করেছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে, তাদের মধ্যে কেউ ঈমান নিয়েছে, কেউ আবার কুফরী করেছে। কাজেই আল্লাহ'র জন্যই

সমস্ত প্রশংসা, যিনি তার প্রতি বিশ্বাস করার জন্য আমাদের শক্তি দান করেছেন এবং তাকে স্বীকার করার জন্য তাওফিক দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বাক্য - الْحَيُّ الْقَيُّومُ

আরবী ভাষায় حَيٌّঅর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহর নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছে যে, তিনি সর্বদা জীবিত; মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। قَيُّومশব্দ কেয়াম থেকে উৎপন্ন, এটা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকেও বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। কাইয়ূম আল্লাহর এমন এক বিশেষ গুণবাচক নাম যাতে কোন সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তার সত্তা স্থায়ীত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা, যে নিজের স্থায়ীত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে জন্যই কোন মানুষকে কাইয়ূম বলা জায়েয নয়। যারা আবদুল কাইয়ূম নামকে বিকৃত করে শুধু কাইয়ুম বলে, তারা গোনাহগার হবে। অনুরূপভাবে, আল্লাহর এমন আরও কিছু নাম আছে, যেগুলো কোন বান্দাহর বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন, রাহমান, মান্নান, দাইয়্যান, ওয়াহহাব এ জাতীয় নামের ব্যাপারেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য। আল্লাহর নামের মধ্যে (الْحَيُّ الْقَيُّومُ) অনেকের মতে ইসমে-আযম।

৩য় বাক্যঃ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

অনুবাদঃ তাকে ধরে না তন্দ্রা, আর না নিদ্রা।

কোন অনিষ্টই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি স্বীয় সৃষ্ট জীব থেকে কখনো উদাসীন নন, প্রত্যেকের প্রতি তার সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। সুতরাং, তিনি মুহূর্তের জন্যও অসতর্ক নন। যে যেই অবস্থায় আছে, সবই তার দৃষ্টির গোচরে, তাই কোন কিছুই তার দৃষ্টির আড়ালে নেই। তার দৃষ্টি থেকে কারো গোপন থাকার শক্তি নেই। কেননা, তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, আর নিদ্রাও না।

"لَا تَأْخُذُهُ" এর শাব্দিক অর্থ হলো, তাকে কাবু করতে পারে না। অর্থাৎ তিনি ক্লান্তিহীন ও সর্বদা সজাগ।

"سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ" এজন্য বলা হয়েছে যে, তিনি তন্দ্রা ও নিদ্রার চাইতে অধিক শক্তিশালী।

আবু মুসা থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে চারটি কথা বললেন, তা এই –

নিশ্চয়ই আল্লাহ নিদ্রা যান না, আর তার জন্য নিদ্রা শোভনীয়ও না। কেননা, তিনি দাঁড়িপাল্লা সমুন্নত করে রাখেন। আর তার কাছে রাতের আমল দিনের পূর্বে আর দিনের আমল রাতের পূর্বে পেশ করা হয়। তার ও সৃষ্টি জগতের মাঝখানে নূর বা আগুনের পর্দা রয়েছে। যদি তা অপসারিত হয়, তা হলে তার দৃষ্টি গোচরের সবকিছুই পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। (তাফসীরে ইবনে কাসির)

আল্লাহ তাআলাকে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ও আপদ-বিপদ স্পর্শ করে না। পক্ষান্তরে, তন্দ্রা ও নিদ্রা হচ্ছে শরীরের দুটো অবস্থার নাম, যা ধীশক্তিসম্পন্ন লোকের ধীশক্তি ঢেকে ফেলে, অবচেতন করে দেয়, আর এ দুটো অবস্থা যাকে স্পর্শ করে তার মধ্যে পূর্বাবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ও পরিবর্তিত অবস্থার জন্ম দেয়। এখন আমাদের ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটির অর্থ হচ্ছে –

"আল্লাহ" এমন এক সত্তার নাম, যিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই। যিনি জীবিত, তার কোন মৃত্যু নেই, তিনি ছাড়া অন্য সকলের যিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেন, রিযিক দান করেন আর এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন হওয়া ও যাবতীয় কাজ-কারবার সম্পাদন করার সকলকে তাওফিক দান করেন।

তাকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। কোন বস্তু অন্যের মধ্যে যেরূপ পরিবর্তন সাধন করে, তার মধ্যে এরূপ পরিবর্তন সাধন করে না। রাত-দিন, যুগ-যুগান্তর ও বিভিন্ন পরিবর্তনশীল অবস্থাদির পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য বস্তুতে যেরূপ অহরহ পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে, তার মধ্যে এরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। বরং তিনি পরিবর্তনহীন একই অবস্থায় সর্বকালে বিরাজমান এবং তিনি সমগ্র মাখলুকের রক্ষণাবেক্ষণে সদা-সর্বদা সচেতন ও সুযত্নবান। কাজেই, যদি তাকে নিদ্রা স্পর্শ করতো, তাহলে তিনি প্রভাবিত হয়ে পড়তেন, কেননা নিদ্রা নিদ্রায় মগ্ন ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যদি তিনি তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়তেন, তাহলে আসমান-যমিন ও উভয়ের মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান, তা ধ্বংস হয়ে যেতো। কেননা, এসবের রক্ষণাবেক্ষণ তারই তদবীর ও কুদরতের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। অথচ নিদ্রা রক্ষণাবেক্ষণকারীকে তার রক্ষণাবেক্ষণ কর্ম পরিচালনা থেকে বিরত রাখে। অনুরূপভাবে তন্দ্রাও তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে তার কর্তব্য কাজ যথাযথ আঞ্জাম দিতে দেয় না। (তাফসীরে তাবারী)

৪র্থ বাক্যঃ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

অনুবাদঃ আকাশসমূহে যা রয়েছে আর পৃথিবীতে যা রয়েছে – সব তারই সত্তাধীন।

অর্থাৎ এর মর্যাদা হলো যে, সমগ্র সৃষ্টি তার দাসত্বে নিয়োজিত, সবই তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, সবই তার আয়ত্তাধীন এবং সব কিছুর উপর তার একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। যথা আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন –"আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে, সে দয়াময়ের নিকট বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে না। অবশ্যই তিনি তাদের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন আর তাদেরকে পূর্ণরূপে গণনা করেছেন। আর তাদের প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন তার কাছে একা আসবে।" (সূরাহ মারইয়াম, ১৯ : ৯৩-৯৫)

এ আয়াতাংশে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সমস্ত কিছুর মালিকই তিনি, তার কোন শরীক বা অংশীদার নেই। তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। অন্য সকল ভ্রান্ত মাবুদ ও উপাস্য সৃষ্টিকর্তা নয়।

"لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ" কালেমা দ্বারা এ অর্থ নেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করা উচিত বা সঙ্গত নয়। কেননা, মালিকানা সম্পত্তি মালিকের হাতেরই পুতুল বিশেষ। মালিকের অনুমতি ছাড়া মামলুক ব্যক্তি বিশেষ অন্যের সেবা করতে পারে না।

এজন্যই আল্লাহ ইরশাদ করেন যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তার সমস্তই আমার মালিকানা সম্পদ ও আমার সৃষ্টি। সুতরাং আমার মাখলুকের কারোরই অন্যের উপাসনা করার অধিকার নেই। আমিই তার মালিক। কেননা, কোন গোলামের জন্য সঙ্গত নয় যে, সে তার মালিক ছাড়া অন্যের ইবাদাত বা সেবা করবে। সুতরাং সে তার মালিক ও প্রভু ছাড়া অন্যের আনুগত্য স্বীকার করে না।

৫ম বাক্যঃ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

অনুবাদঃ এমন কে আছে, যে তার অনুমতি ছাড়া তার কাছে সুপারিশ করবে ?

এমন কে আছে যে, তার সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তার অনুমতি ব্যতীত? এতে বুঝা যায় যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মালিক এবং কোন বস্তু তার চাইতে বড় নয়, তাই কেউ তার কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারত যে, কেউ কারো জন্য সুপারিশ করে, তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহর কিছু খাস বান্দা আছেন, যারা তার অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সুপারিশ করব। [মুসলিমঃ ১৯৩] একে 'মাকামে-মাহমুদ' বলা হয়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য খাস। অন্য কারো জন্য নয়।

আল্লাহ ইরশাদ করেন –
"সেদিন সুপারিশ উপকার দিবে না, কিন্তু ঐ ব্যক্তির জন্য ছাড়া – যাকে আল্লাহ তাআলা সুপারিশের অনুমতি প্রদান করবেন আর যার কথা পছন্দ করবেন।" (সূরাহ তো-হা, ২০ : ১০৯)
ফেরেশতাদের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে –
"আল্লাহ তাদের আগেপিছের সমস্ত অবস্থা জানেন, তারা কেবল ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারবে, যার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট, তারা সবাই আল্লাহ'র ভয়ে প্রকম্পিত থাকবে।" (সূরাহ আল-আম্বিয়া, ২১ : ২৮)
"আকাশসমূহে বহু ফেরেশতা রয়েছে, কিন্তু তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না; তবে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করে সন্তুষ্ট হয়ে কাকেও অনুমতি দান করেন, তবে তা অন্য কথা।" (সূরাহ আন নাজম, ৫৩ : ২৬)

৬ষ্ঠ বাক্যঃ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

অনুবাদঃ তাদের সামনে যা রয়েছে আর তাদের পিছনে যা রয়েছে তিনি তা অবগত আছেন।
আল্লাহ তাআলা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত। যেমন কুরআনে উল্লেখ হয়েছে –
"(জিবরীল বললোঃ) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না, যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এ দুই-এর মধ্যস্থলে আছে, সবই তার, এবং আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন।" (সূরাহ মারইয়াম, ১৯ : ৬৪)

এ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছে বা হবে – সবকিছুর সম্বন্ধেই তিনি অবগত, তার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই।

আল্লাহ তাআলা অগ্র-পশ্চাৎ যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অগ্র-পশ্চাৎ বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা আল্লাহ'র জানা রয়েছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বুঝানো হয়েছে, যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য, আর পশ্চাৎ বলতে বুঝানো হয়েছে যা অদৃশ্য। তাতে অর্থ হবে এই যে, কোন কোন বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহ'র ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তার জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের উপরই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এ দুটোতে কোন বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয় দিকই বুঝানো হয়।

৭ম বাক্যঃ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

অনুবাদঃ আর যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তার ইলমের কিছুই তারা (সৃষ্টিকুল) আয়ত্ব করতে পারে না।

অর্থাৎ, কেউই তার জ্ঞানের একটি অংশবিশেষকেও পরিবেস্টিত করতে পারে না। তবে আল্লাহ যাকে জানাবার ইচ্ছে করেন, সে-ই কেবল কিছু জানতে পারে।

এর অর্থ এটিও হতে পারে যে, আল্লাহ তার জাতিসত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কাকেও জ্ঞান দান করেন না, তবে যাকে জানাবার ইচ্ছা করেন তাকে জানান। যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেন –"..... আর তারা তাকে নিজ জ্ঞানের পরিধিতে বেষ্টন করতে পারে না।" (সূরাহ তো-হা, ২০ : ১১০)

তিনি এমন জ্ঞানী যার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই এবং প্রত্যেক জিনিসকেই স্বীয় জ্ঞান দ্বারা আয়ত্তাধীন রেখেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এরূপ গুণের অধিকারী নন এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ তিনি যা ইচ্ছা করেন তার চেয়ে অধিক কোন কিছুর জ্ঞান রাখেন না। অন্য কথায়, তিনি যে জ্ঞান সম্বন্ধে কাউকে অবগত করাবার ইচ্ছা করেন, সে তা-ই জানে, এর চেয়ে অধিক জানে না। এটি এজন্য যে, যদি কোন ব্যক্তি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত না হয়, তাহলে তার সত্তার ইবাদাত করা সঙ্গত হতে পারে না। আর যারা কিছুই বুঝে না, যেমন মূর্তি ও দেবদেবী, তাদের ইবাদাত কিভাবে সঙ্গত হতে পারে ? এজন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেন যে, তোমরা এমন সত্তার জন্য ইবাদাত নির্ধারণ করো, যিনি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন, তার কাছে ছোট-বড় কোন কিছুই গোপন থাকে না।

অর্থাৎ, মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ'র জ্ঞানের কোন একটি অংশবিশেষকেও পরিবেস্টিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন, শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহ'র জ্ঞানের আওতাভুক্ত – এটি তার বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়।

"إِلَّا بِمَا شَاءَ" – (স্বীয় প্রজ্ঞা ও উপযোগিতা অনুযায়ী)। এখানে এ তত্ত্ব বিবৃত হয়েছে যে, বান্দা যতো বড় আলিম আরিফ'ই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তার জ্ঞান তো সীমাবদ্ধই এবং আল্লাহ'র জ্ঞান ও ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের অধীন।

"তারা তার জ্ঞানের কোন কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না" – অর্থাৎ, তার জ্ঞাত বিষয়সমূহ। সবকিছুই আল্লাহ'র জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও "তার জ্ঞান" বলে তাদের আয়ত্ত না করতে পারাকে সীমিতরূপে উল্লেখ করার কারণ এ কথা বুঝানো যে, এখানে আয়ত্ত করা দ্বারা জ্ঞানমূলক আয়ত্ত উদ্দেশ্য। আয়ত্ত করতে পারে না বলা হয়েছে, "তারা কোন কিছু জানে না" বলা হয়নি। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বস্তুর মূলতত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ পরিব্যাপ্ত জ্ঞান আল্লাহ'র জন্যই খাস, অন্য কারো মাঝে কদাচিৎ কোন কিছুর তত্ত্ব জ্ঞান পাওয়া যায় না। অথবা তার জ্ঞান দ্বারা তার জন্য বিশিষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ "ইলমুল গাইব" – অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। কেননা, তারা অদৃশ্য জ্ঞানের কোন কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না।

৮ম বাক্যঃ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

অনুবাদঃ তার কুরসী আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত।

তার কুরসী এত বড় যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমীন পরিবেষ্টিত রয়েছে। হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। ইবনে কাসীর আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কুরসী কি এবং কেমন? তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার কছম, কুরসীর সাথে সাত আসমানের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মত। আর কুরসীর উপর আরশের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন আংটির বিপরীতে বিরাট ময়দানের শ্রেষ্ঠত্ব। [ইবন হিব্বান: ৩৬১ বায়হাকী: ৪০৫]

৯ম আয়াতঃ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

অনুবাদঃ আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না।

অর্থাৎ, আসমান ও যমিন এবং এর অভ্যন্তরের প্রতিটি সৃষ্টিকে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার জন্য কোন কষ্টকর ব্যাপার নয়, বরং এটি তার জন্য খুবই সহজ। আর সমগ্র সৃষ্টি তার কাছে অতি নগণ্য ও তুচ্ছ এবং সকলেই তার নিকট মুখাপেক্ষী ও দরিদ্র। তিনি ঐশ্বর্যশালী ও অতি প্রশংসিত। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। তাকে হুকুম দেওয়ার কেউ নেই। নেই তার কাজের কোন হিসাব গ্রহণকারী। তিনিই সকল বস্তুর উপর একচ্ছত্র ক্ষমতাবান ও সকলের হিসাব আদায়কারী, সকল জিনিসের একমাত্র মালিকানা তার। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, নেই কোন প্রতিপালক।

মুশরিক জাতিগুলো ধারণা করে নিয়েছে যে, এতো বিশাল-বিস্তীর্ণ ও বিজন প্রান্তর, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই, তার দেখাশুনা আল্লাহ একা কি করে করবেন ? এ কারণে (নাউযুবিল্লাহ) তিনি কখনো ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে যেতে পারেন, আর এসব সামাল দেওয়ার জন্য তার অংশীদার ও সহায়কেরও প্রয়োজন হতে পারে। আল্লাহ'র অবসন্ন হওয়া ও বিশ্রাম নেওয়া সম্পর্কে স্বয়ং ইহুদী-খৃষ্টানদের বিশ্বাস এ দিকেই ইঙ্গিত করে। (তাফসীরে মাজেদী)

আল্লাহ আতাআলা এ দুনিয়ার বাদশাহদের মতো নন, যারা নিজেদের রাজত্ব সামাল দেওয়ার জন্য বহুসংখ্যক সহকারী ও সাহায্যকারীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। তাদের ছাড়া রাজ্যের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। বরং তিনি অসীম জ্ঞান, অশেষ ক্ষমতা ও সীমাহীন শক্তি প্রয়োগের অধিকারী। সুতরাং যেভাবে আমরা আমাদের বাড়ির প্রাঙ্গনকে দেখাশোনা করি, তার চেয়েও লাখো গুণ সহজতরভাবে তিনি তার আসমান ও যমিনব্যাপী রাজত্বের শৃঙ্খলা রক্ষা করেন এবং এটা তার জন্য বিন্দুমাত্র দুঃসাধ্য ব্যাপার নয় যে, কারো পক্ষ থেকে সহযোগিতার প্রয়োজন পড়তে পারে।

১০ম বাক্যঃ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

অনুবাদঃ আর তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, সর্বোচ্চ মাহাত্ম্যের অধিকারী।

তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্ববর্তী নয়টি বাক্যে আল্লাহ'র সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার ও বুঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত বড়ত্ব ও মহত্ত্ব এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা। এ দশটি বাক্যে আল্লাহ'র যাত ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

তার সত্তা বিশালতম ও শ্রেষ্ঠতম। তার জ্ঞান, তার ক্ষমতা ও তার ব্যাপকতাকে নিজেদের সীমিত পাল্লায় পরিমাপ করো না, এখান থেকেই তো তার সম্পর্কে বিভ্রান্তি বা পথচ্যুতির সৃষ্টি হয় আর শিরকের বিভিন্ন পথ উন্মুক্ত হয়। তার গুণাবলী সম্পর্কে তিনি স্বয়ং যা কিছু বলেন তার উপর ঈমান আনো। ধারণা ও অনুমান এবং সাদৃশ্য ও উপমার খেয়ালীপনা থেকে দূরে থাকো।

ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের তাফসীর শেষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেনঃ

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতটি এবং এ ধরণের যতো আয়াত ও হাদিস রয়েছে, এ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী বিজ্ঞ আলিমগণের অভিমত হলো, এ বিষয়গুলোর প্রকৃত অবস্থা জানার চেষ্টা না করে ও প্রলম্বিত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে তা যেভাবে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, সেভাবে তার প্রতি ঈমান রাখা এবং কোন বস্তুর সাথে তার পরিমাপ ও তুলনা না করাই ঈমানদারের কাজ। তাহলে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে না।

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

২৫৬. দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কেন জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। অতএব, যে তাগুতকে অস্বীকার করবেও আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারন করল যা কখনো ভাঙ্গবে না। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

এখানে দীন বলতে ওপরের আয়াতে বর্ণিত আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ সম্পর্কিত আকীদা ও সেই আকীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'ইসলাম' এর এই আকীদাগত এবং

নৈতিক ও কর্মগত ব্যবস্থা কারো ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না। যেমন কাউকে ধরে তার মাথায় জোর করে একটা বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়, এটা তেমন নয়।

তাগূত’ শব্দটি আরবী ভাষায় সীমালংঘনকারী বা নির্ধারিত সীমা অতিক্রমকারী ব্যাক্তিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইসলামী শরী’আতের পরিভাষায় তাগূত বলা হয়ে থাকে এমন প্রত্যেক ইবাদতকৃত বা অনুসৃত অথবা আনুগত্যকৃত সত্তাকে, যার ব্যাপারে ইবাদতকারী বা অনুসরণকারী অথবা আনুগত্যকারী তার বৈধ সীমা অতিক্রম করেছে আর ইবাদাতকৃত বা অনুসৃত অথবা আনুগত্যকৃত সত্তা তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছে বা সেদিকে আহবান করেছে। [ইবনুল কাইয়্যেম: ইলামুল মু'আক্কোয়ীন] সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, তাগূত এমন বান্দাকে বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভূ ও ইলাহ হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে।

আল্লাহর মোকাবেলায় বান্দার প্রভূত্বের দাবীদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বান্দা নীতিগতভাবে তার শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু কার্যত তার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। একে বলা হয় ‘ফাসেকী’। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে আল্লাহর শাসন-কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় কুফর ও শির্ক। তৃতীয় পর্যায়ে সে মালিক ও প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার রাজ্যে এবং তার প্রজাদের মধ্যে নিজের হুকুম চালাতে থাকে। এ শেষ পর্যায়ে যে বান্দা পৌছে যায়, তাকেই বলা হয় তাগুত।

এ ধরণের তাগূত অনেক রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ তাগুত ওলামায়ে কেরাম পাঁচ প্রকার উল্লেখ করেছেন। **(এক)** শয়তান, সে হচ্ছে সকল প্রকার তাগূতের সর্দার। যেহেতু সে আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে বিরত রেখে তার ইবাদাতের দিকে আহবান করতে থাকে, সেহেতু সে বড় তাগুত। **(দুই)** যে গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে বলে দাবী করে বা অদৃশ্যের সংবাদ মানুষের সামনে পেশ করে থাকে। যেমন, গণক, জ্যোতিষী প্রমূখ। **(তিন)** যে আল্লাহর বিধানে বিচার ফয়সালা না করে মানব রচিত বিধানে বিচার-ফয়সালা করাকে আল্লাহর বিধানের সমপর্যায়ের অথবা আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম মনে করে থাকে। অথবা আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে বা মানুষের জন্য হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করাকে নিজের জন্য বৈধ মনে করে। **(চার)** যার ইবাদাত করা হয় আর সে তাতে সন্তুষ্ট। **(পাঁচ)** যে মানুষদেরকে নিজের ইবাদাতের দিকে আহবান করে থাকে। উপরোক্ত আলোচনায় পাঁচ প্রকার তাগূতের পরিচয় তুলে ধরা হলেও তাগূত আরও অনেক রয়েছে। [কিতাবুত তাওহীদ]

এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত নীতিমালার আলোকে আমরা সকল প্রকার তাগূতের পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হব। (১) আল্লাহর রুবুবিয়্যত তথা প্রভূত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্যের দাবী করা। (২) আল্লাহর উলুহিয়াত বা আল্লাহর ইবাদাতকে নিজের জন্য সাব্যস্ত করা। এ হিসেবে আল্লাহর রুবুবিয়াতের বৈশিষ্ট্য যেমন, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, জীবিতকরণ, মৃত্যুদান, বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকরণ, হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন ইত্যাদিকে যে ব্যক্তি নিজের জন্য দাবী করবে সে তাগুত। অনুরূপভাবে আল্লাহকে ইবাদাত করার যত পদ্ধতি আছে যে ব্যক্তি সেগুলো তার নিজের জন্য চাইবে সেও তাগূত। এর আওতায় পড়বে ঐ সমস্ত লোকগুলো যারা

নিজেদেরকে সিজদা করার জন্য মানুষকে আহবান করে। নিজেদের জন্য মানত, যবেহ, সালাত, সাওম, হজ ইত্যাদির আহবান জানায়।

তাগূতকে অস্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, তাগূত নেই বলে বিশ্বাস পোষণ করা। বরং তাগুতকে অস্বীকার করা বলতে বুঝায় আল্লাহর ইবাদাত ছাড়া অন্য কারো জন্য ইবাদাত সাব্যস্ত না করা এবং এ বিশ্বাস করা যে আল্লাহর ইবাদাত ছাড়া সকল প্রকার ইবাদাতই বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। আর যারা আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে কোন কিছু তাদের জন্য দাবী করে থাকে তাদেরকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং এ বিশ্বাস করা যে তাদের এ ধরণের কোন ক্ষমতা নেই।

ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সে জন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে কোন শক্ত দড়ির বেষ্টনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে পতন থেকে মুক্তি পায়। আর এমন দড়ি ছিঁড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোন রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার।

ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّـٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

২৫৭. আল্লাহ তাদের অভিভাবক যারা ঈমান আনে, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করে তাগূত তাদের অভিভাবক, এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

"তাগুত" শব্দটি এখানে বহুবচন (তাওয়াগীত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ একটি তাগুতের শৃংখলে আবদ্ধ হয় না বরং বহু তাগুত তার ওপর ঝেঁকে বসে। শয়তান একটি তাগুত। শয়তান তার সামনে প্রতিদিন নতুন নতুন আকাশ কুসুম রচনা করে তাকে মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে রাখে। দ্বিতীয় তাগুত হচ্ছে মানুষের নিজের নফস। এই নফস তাকে আবেগ ও লালসার দাস বানিয়ে জীবনের আঁকাবাঁকা পথে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। এ ছাড়া বাইরের জগতে অসংখ্য তাগুত ছড়িয়ে রয়েছে। স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজীন, পরিবার, বংশ, গোত্র, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজন, সমাজ,জাতি, নেতা,রাষ্ট্র, দেশ, শাসক ইত্যাকার সবকিছুই মানুষের জন্য মূর্তিমান তাগুত। এদের প্রত্যেকেই তাকে নিজের স্বার্থের দাস হিসেবে ব্যবহার করে। মানুষের তার এই অসংখ্য প্রভুর দাসত্ব করতে করতে এবং এদের মধ্যে থেকে কাকে সন্তুষ্ট করবে আর কার অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবে এই ফিকিরের চক্করে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়।

তাফসীর সমাপ্ত

প্রস্তুতি সহায়ক এই নোট তৈরী করতে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ, বিভিন্ন ভাই-বোনের দারস/নোট, ইন্টারনেট থেকে তথ্য ইত্যাদির সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ প্রত্যকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

আমাদের এই নোটগুলোতে কোনো ধরনের ভুল পরিলক্ষিত হলে অথবা অন্য কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদের জানাবেন ইনশাআল্লাহ।

ফুটনোট

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

* সকল ইবাদত পাওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।
* আল্লাহ তা'আলা ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাকে স্পর্শ করতে পারে না।
* আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না।
* আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞান দ্বারা সবকিছু বেষ্টন করে আছেন।
* আল্লাহ তা'আলা স্ব-স্বত্তায় ওপরে আছেন- সর্বত্র বিরাজমান নন।
* তিনি ক্লান্ত হন না
* আর তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, সর্বোচ্চ মাহাত্মের অধিকারী।

* কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না, দাওয়াত দেয়ার পর কবূল না করলে মুসলিমদের অধীনে থেকে জিযিয়া দিতে হবে।
* ইসলাম একমাত্র সঠিক ধর্ম যা সুপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
* তাগুত বর্জন করা ছাড়া মু'মিন হওয়া যায় না।
* সঠিক পথ ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র রজ্জু দীন ইসলাম, যা কেউ ধারণ করলে পথভ্রষ্ট হবার আশংকা নেই।
* ঈমানদারদের স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন।
* আল্লাহ তা'আলার অভিভাবকত্ব পেতে হলে সকল প্রকার তাগুত বর্জন করে এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনতে হবে, ঈমানের সাথে কুফর মিশ্রিত থাকলে হবে না।
* কাফিরদের অভিভাবক শয়তান, মানুষ ও জিনরূপী শয়তান।
* শয়তান একটি তাগুত। দ্বিতীয় তাগুত হচ্ছে মানুষের নিজের নফস।
* ঈমান দু'টি বিষয় ছাড়া অর্জিত হয় না, ১. তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে। ২. আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনতে হবে।

* আয়াতুল কুরসীকে ইসমে আযমও বলা হয়।
* যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে যেতে মৃত্যু ছাড়া কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।
* যে ব্যক্তি রাতে ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে এবং ভোর পর্যন্ত তার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না।
* যে ব্যক্তি সকাল বেলায় আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। আবার সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে।